# শিক্ষাঙ্গনে ছাত্র-রাজনীতি—— একুশ শতকের দ্বিতীয় দশকে বিশ্বভারতী

একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচয় তার শিক্ষার্থীদের গুণমানের উপরও নির্ভর করে। এখানে 'গুণমান' বলতে কেবল লেখাপড়ার উৎকর্ষই বোঝাচ্ছে না, বরং একজন শিক্ষার্থী কীভাবে অঙ্গনে বা বাইরের দুনিয়ায় তার যথাকর্তব্য সম্পাদন করছে তাও বোঝাচ্ছে। একটু ব্যাখ্যা করলে বললে বলা যায়, একজন ছাত্রের ছাত্রত্বই আর অবশিষ্ট থাকে না যদি সবার প্রতি সযত্নশীলতা, সচেতনতা এবং সমানুভূতির মতো মূল্যবোধগুলি সে আত্মস্থ করতে না পারে; এবং 'বিদ্যা দদাতি বিনয়ম্' (বিদ্যা মানুষকে বিনয়ী করে তোলে)-এর মতো আপ্তবচন— যা তাকে সবার প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তোলে তার অনুশীলন না করে। মানবতার শ্রেষ্ঠ চিন্তকেরা, তাঁদের চিন্তাধারায়, তাঁদের সৃজনশীল রচনায়, এইদিকটির উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন কারণ ছাত্রেরা হল একাধারে মূল্যবোধের আধার; এবং সেইসঙ্গে তাদের মাধ্যমেই মূল্যবোধ প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে সঞ্চারিত হয়। সুতরাং, এক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা শুধু গুরুত্বপূর্ণই নয়, বরং অপরিহার্য বলা যায়।

একটা অভিযোগ প্রায়শই শোনা যায়। পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধার অভাব ভবিষ্যতের সমাজ-গঠনে ছাত্রদের প্রয়াসী করে তোলার পক্ষে অন্তরায়। ইতিহাস কিন্তু সে কথা বলে না। সবাই জানেন, নোবেলজয়ী সিভি রমন আজকের নিরিখে খুবই সামান্য উপকরণ নিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর বিরল গবেষণা সম্পন্ন করেছিলেন। অভিযোগের সুরে নয়, বিজ্ঞানের অচর্চিত ক্ষেত্রে গবেষণায় তাঁর প্রেরণাদাতা শিক্ষকদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে গিয়ে নিতান্ত তথ্য হিসেবে তিনি নিজেই একথা বলেছেন। তিনি বলেছিলেন, আলোক বিজ্ঞানে গবেষণা করে তিনি যে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন তা সম্ভব হয়েছে কারণ তাঁর মহদাশয় শিক্ষকেরা এব্যাপারে তাঁদের ভাবনাচিন্তা ও তথ্যাদি অকাতরে তাঁকে ব্যবহার করার সুযোগ দিয়েছিলেন। এই সম্পর্ক সিদ্ধ হয় উভয়পক্ষের পারস্পরিকতায়। শিক্ষকদের প্রতি রমনের শ্রদ্ধাবোধ তাঁর শিক্ষকদের মনে তাঁর জন্য একটা সস্নেহ পরিসর তৈরি করেছিল; যার ফলে শুধু লেখাপড়ার ক্ষেত্রে নয়, জীবনের অন্য অনেক ক্ষেত্রেও তাঁরা নিজেদের উজাড় করে দিয়েছিলেন রমনকে। পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ সামাজিক-সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের একটি প্রধান শর্ত, যা আজ বিপন্ন বলা যায়।

আরও উৎকণ্ঠার বিষয় হল, শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ একশ্রেণির শিক্ষকের আচরণ; যাঁরা ভুলে গেছেন ছাত্র আর শিক্ষকদের সম্পর্কের সেতু কীভাবে তৈরি হয়! নির্লজ্জভাবে তাঁরা ছাত্রদের তাঁদের কায়েমি স্বার্থে ব্যবহার করে থাকেন। এখন এটা একটা ব্যাপক সমস্যা হিসেবেও পরিগণিত হচ্ছে। আজ যে ছাত্ররা শ্রদ্ধাশীল হতে পারল না, কাল যখন তারা শিক্ষক হবে তখন তাদের আচরণে আমূল বদল আসবে তা মনে হয় না। আমরা জানি, সমাজ-সংস্কৃতিগতভাবে খারাপ আচরণ ছাত্রদের চরিত্রগঠন পর্বকে নিদারুণ প্রভাবিত করে; এবং কমবেশি তাদের মনে স্থায়িভাবে তা মুদ্রিত থাকে। এর ব্যতিক্রম ঘটে না তা অবশ্য আমি বলছি না। আমার মূল প্রতিপাদ্য হল যে, মোটের উপর সামাজিক-সাংস্কৃতিক অবক্ষয় নিবারণের জন্য এই বিষয়টিকেও যুক্তিনিষ্ঠভাবে বিবেচনায় আনা দরকার।

শিক্ষাঙ্গনে কোমলমতি ছাত্রদের ভুলপথে পরিচালিত করার ক্ষেত্রে শিক্ষকদের ভূমিকার বিষয়টি একটু ব্যাখ্যা করে বলা যেতে পারে। বস্তুত এটা একটা সাধারণ প্রবণতা। তথাকথিত ওই শিক্ষকেরা জেনেশুনেই তাঁদের স্বার্থ-প্রণোদিত লক্ষ্য পূরণ করার জন্য এজাতীয় কাজ করে থাকেন; এবং এটা

তাঁরা ভুলে যান যে এরফলে তাঁরা যে শুধু ছাত্রদেরই ক্ষতিসাধন করেন তা-ই নয়, মানব-ইতিহাসে এভাবে তাঁরা 'সামাজিক অপশক্তি'র জন্ম দেন। অথবা, বৌদ্ধ রূপক ব্যবহার করে বলা যায়, তাঁরা সামাজিক দুষ্কর্ম ও মানবতা-লাঞ্ছনার দুষ্ট ভূমিকা পালনের জন্য চিরকাল 'মার'-এর মতো চিহ্নিত হয়ে থাকবেন।

কেউ বলতে পারেন তাদের মোকাবিলার উপায় কী? আমার উত্তর হল, ইতিহাসই এই মানবিক মূল্যবোধের স্বঘোষিত ঘাতকদের প্রতিকারের ব্যবস্থা নেবে। আজকের এই পঙ্কিল সামাজিক মাধ্যমের যুগে এইসব 'ঘটনাচক্রে হয়ে-ওঠা শিক্ষকদের' ভূমিকা আগের যুগের তুলনায় অনেক বেশি উন্মোচিত হয়ে যাচ্ছে। একটু নজর করলেই দেখা যায়, বিপথচালিত ছাত্ররা তাদের 'মন্ত্রণাদাতাদের' লিখে দেওয়া 'বাণী' কীভাবে সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে দিচ্ছে! আমি একথা বলছি কারণ ওইসব পথচ্যুত ছাত্ররা আসলে অর্থপূর্ণ কোনও বিবৃতি রচনা করার ক্ষমতাও রাখে না। সহজেই এর প্রমাণ পাওয়া যেতে পারে ওইসব ছাত্রদের শিক্ষকদের মধ্যে যাঁরা তাদের পরীক্ষার খাতা দেখেন তাঁদের সাক্ষ্যে। তাঁদের কেউ কেউ আমাকে অনেক সময় বলেছেন, পরীক্ষায় তাদের লেখার ক্ষমতার বহর দেখলে চোখে জল আসে! কিন্তু মন্ত্রণাদাতা শিক্ষকেরা তাঁদের সংকীর্ণ স্বার্থপূরণে নির্দয়ভাবে ব্যবহার করতে চান বলে এসব ধর্তব্যের মধ্যেই আনেন না, কারণ ওইসব ছাত্রেরা নিজেদের যথার্থভাবে প্রকাশ করতে শিখে গেলে, তাঁরা মনে করেন, তাদের কাছে তাঁদের আর কোনও গুরুত্ব থাকবে না। ফলে এখন তাদের কাছে তাঁদের যে কদর তাও খোয়া যাবে। ইতিহাস ও ভবিষ্যতের মানবতা কোনওদিন এঁদের ক্ষমা করবে না; এবং আজকের এই সামাজিক-সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের জন্য ভবিষ্যতে তাঁরা দায়ী থাকবেন তা উপলব্ধি না করে তথাকথিত ওই শিক্ষকেরা এই নোংরা খেলা খেলেই চলেছেন।

প্রকৃতির বিস্তৃত বাস্তুতন্ত্র— যার মধ্যে আমরা বেঁচে আছি, তাকে উপলব্ধির দৃষ্টি হারানো ঠিক নয়। মানুষের আবেগগত বা নৈতিক পথ-প্রদর্শনের জন্য কারোর প্রত্যাশা করে বসে থাকা চলে না। সব জায়গাতেই কিছু অনটন থাকে। যাঁদের সমাজে কিছু ভূমিকা থাকার কথা ছিল, তাঁরা স্বার্থপর ও মতলববাজ হিসেবে পরিগণিত হওয়া ছাড়া নিজেদের আর কোনওভাবেই প্রতিষ্ঠা করতে পারলেন না। এভাবেই একজন বিশ্বখ্যাত ব্যক্তিত্ব সামাজিক দিক থেকে গ্রহণযোগ্য নয় এমন কাজ করেও মানুষের ক্রোধ থেকে তাঁর বশংবদদের সমর্থনে পার পেয়ে যান। যাঁরা একটু অন্যরকমভাবে ভাবেন বা তথাকথিতভাবে নির্ধারকের ভূমিকা সম্পর্কে অবহিত; তাঁরা, সম্ভবত বিরূপ পরিণতির জন্য, বা এমনকি মানব জীবনের স্বঘোষিত সামাজিক-নৈতিক অভিভাবকদের দ্বারা পরিত্যক্ত হওয়ার ভয়ে তাঁদের আওয়াজ তুলতে খুব ভয় পান।

মিথ্যা কথা বলা এবং কাদাছোড়া চিরকাল সামাজিক ব্যবস্থায় নিন্দনীয়। এসব করার উদ্দেশ্য হল যেনতেন প্রকারে নিজেদের স্বার্থপূরণ। দুয়েকটি ক্ষীণ কণ্ঠের প্রতিবাদ ছাড়া সামাজিক স্তরে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে উপর থেকে তলা পর্যন্ত সব প্রতিবাদী স্বর এভাবে রুদ্ধ হয়ে থাকাটাই এখন দস্তুর হয়ে গেছে। যদি কায়েমি স্বার্থের বিরুদ্ধে কোনও প্রবল স্বর শোনা যায়ও, তাহলেও তাকে স্তব্ধ বা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য অশুভ কোনও সিস্টেম সক্রিয় হয়ে ওঠে। সেই প্রতিবাদী বা অস্বস্তিকর প্রশ্নতোলা ব্যক্তিদের মর্যাদাহানি, কলঙ্কলেপন এমনকি প্রাণনাশের ঘটনা ঘটাও খুব বিচিত্র নয়। দৈনিক সংবাদপত্রগুলিতে এমন হরহামেশা দেখা যায়।

সুতরাং, শিক্ষাঙ্গনের অবক্ষয় তার সামাজিক প্রতিবেশ থেকে মুক্ত নয়, এবং তা আসলে সেই অবক্ষয়েরই অতিক্ষুদ্র সংস্করণ। এই পরিস্থিতিতে যা কাম্য তা হল মানুষের সৎ ইচ্ছাবৃত্তিগুলোকে দুর্বল করে না দেওয়া। শিক্ষক এবং ছাত্ররা(সবাই নয় যদিও) এর থেকে মুক্ত থাকবে এমন বিশ্বাস করা মূর্খের স্বর্গে বাস করা ছাড়া আর কিছু নয়। তবু, শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের উপর

যখন ভবিষ্যৎ সমাজগঠনের দায়িত্ব রয়েছে, সেইজন্য, তাঁদের সামজগঠনের চিরকালীন ভূমিকা থেকে এই বিচ্যুতি অবিলম্বে সংশোধিত হওয়া প্রয়োজন। কীভাবে সমাজ থেকে এইসব আগাছা দূর করা যায়? কথাটা মুখে বলা সহজ কিন্তু বাস্তবে খুবই কঠিন কারণ এর গভীর শিকড় এতদূর পর্যন্ত চারিয়ে গেছে যে এসবের সন্তোষজনক সমাধান করতে চাইলে সেই প্রয়াসকে ভেস্তে দিতে পারে।

প্রায় গ্যাংগ্রিনে রূপান্তরিত হওয়ার পর্যায়ে উপনীত হয়ে দৃশ্যমান সামাজিক ক্ষতগুলোর বিচিত্র শিকড়গুলোকে অনুধাবন করার জন্য আমাদের একটি ধারণাগত কাঠামো সামনে রাখতে হবে। এটা নতুন কিছু নয়। কাঠামোটি আদতে ঐতিহাসিকভাবে পরীক্ষিত চিন্তাভাবনার প্রবর্তনামূলক পদ্ধতিগুলির একটি পুনর্প্রয়োগ বলা যেতে পারে। এককথায় বলতে গেলে, আমি গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং মহাত্মা গান্ধীর ধারণা থেকে এটি ধার নিয়েছি। প্রাদুর্ভূত অবক্ষয়ের প্রকৃতি এবং তার উৎসগুলি উপলব্ধি এবং বিচার করার জন্য আমার মানদণ্ড হল 'রাজনীতি'। সাধারণ কথায়, এটিকে ক্ষমতা দখলের একটি উপায় হিসেবে ধরে নেওয়া যায়। কেউ হয়তো কৌটিল্যীয় 'সাম, দাম, দণ্ড ও ভেদ' ধারণাটি এক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারেন; বড় মনোরম করে যেখানে বলতে চাওয়া হয়েছে, শক্তির মোকাবিলা করতে হলে উপায়-অবলম্বনের ক্ষেত্রে সংযত হতে হয় ও কৌশলী হতে হয়, কারণ আখেরে উদ্দেশ্যসাধনই হল মূল লক্ষ্য। কেউ একথা শোনামাত্রই বলবেন, এই কৌশলসর্বস্ব রাজনৈতিক-প্রকরণ প্রত্যাখ্যান করাই কর্তব্য, কারণ এই মতবাদ গান্ধীজির বিশেষ লক্ষ্যাভিমুখী রাজনৈতিক দর্শনের পরিপন্থী। এখানে হিংসাত্মক হয়ে ওঠার কারণে তাঁর অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহারের দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে; যদিও পরে তিনি এই সিদ্ধান্তকে 'হিমালয়প্রমাণ ভুল' হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। রাজনীতির আরেকটি ধারণা আছে যা পরিগ্রহণে রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী এবং তাঁদের অনুসারীরা জোর দিয়েছিলেন। এখানে রাজনীতি হল প্রচলিত ক্ষমতা-সম্পর্ককে রূপান্তরিত করার একটি কার্যকর প্রক্রিয়া; যার অর্থ হল বর্ণ, ধর্ম, শ্রেণি, জাতপাতগত অক্ষের চারপাশে অবস্থিত সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিভাজনের বিরুদ্ধে ন্যায্যতামূলক দৃষ্টিভঙ্গির সপক্ষে বক্তব্য উপস্থাপন। গান্ধী এবং কবি— উভয়েই মানুষের মধ্যে 'নির্মিত বিভাজন'কে ধিক্কৃত করেছিলেন। তাই, তাঁদের প্রধান লক্ষ্য ছিল মানুষের শ্রেণিবৈষম্যমূলক ব্যবধান দূর করা। মানুষের বিচ্ছিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক নানাবিধ কুসংস্কারকে সবসময় নিন্দা করেছেন কবি। তাঁর অনেক সমালোচনামূলক গ্রন্থে বিভাজনমূলক মানসিকতা তৈরির প্রচেষ্টার কঠোর সমালোচনা করা হয়েছে। একই কথা প্রযোজ্য গান্ধীজি প্রসঙ্গেও। এই ধরনের কৃত্রিম ফাটল রদ করার জন্য লেখালেখি এবং সুসংগঠিত কর্মব্রত গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা দুজনেই।

দুয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া, তাঁদের অভিমুখে ছাত্র বা শিক্ষকদের অনুরূপ পদক্ষেপ করতে আমরা কদাচিৎই দেখতে পাই। তবে কৃত্রিম সহানুভূতি প্রদর্শন করে সুবিধেমতো নগদ ফায়দা তোলার দুঃখজনক ঘটনা অবশ্যই ঘটে। নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির লক্ষ্যে আমাদেরই একজন প্রিয় ছাত্রের মৃতদেহ নিয়ে নিম্নমানের রাজনীতি করতেও তাদের বাধে না! তারা শুধু উপাচার্যের বাংলোর প্রধান ফটক ভেঙেই ক্ষান্ত হয়নি, তারা উপাচার্যের আবাসের অন্দরমহলে ঢোকবার চেষ্টা করেছিল— সম্ভবত তাদের দানবীয় হিংসা চরিতার্থ করবার মতলব নিয়ে। ঈশ্বরের করুণায় তা হতে পারেনি; যেহেতু রাজ্যের শীর্ষ নাগরিক— পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় রাজ্যপালের হস্তক্ষেপে দেশের নিরপেক্ষ আইনশৃঙ্খলা বাহিনী তাদের সময়মতো প্রতিহত করেছিল। তা নাহলে এই বার্তালাপ লেখার জন্য হয়তো আমি বেঁচে থাকতাম কি না সন্দেহ!

ছাত্ররা ছাত্র। সুতরাং, তাদের শুধুমাত্র 'অধিকার' আছে কিন্তু কোনও 'কর্তব্য' নেই। এভাবেই ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীদের ভূমিকা নির্দিষ্ট-নির্ধারিত হয়ে গেছে যেন! বস্তুত, রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতাতেই ভারতীয় সংবিধানের পরিপন্থী এই ধারণাটি গড়ে তোলা হয়েছে। যেহেতু তাদের শুধুমাত্র 'অধিকার'

আছে এবং তারা রাজনৈতিক কর্তাব্যক্তিদের আশীর্বাদধন্য, তাই তাদের যা-খুশি করার অধিকারবোধ তৈরি হয়; যা সবসময় ন্যায়সংগত হতে পারে না। যদি একজন শিক্ষক প্রমাণিত হন (যা হয়তো ঘটেনি এমন কোনও অভিযোগে) তিনি কোনও ছাত্রকে তার জাতপাত নিয়ে কটূক্তি করেছেন, তাহলে শিক্ষকটিকে সহজেই জেলে দেওয়া যেতে পারে! কিন্তু এর বিপরীতটা ঘটে না। যেমন যদি একজন ছাত্র শিক্ষককে গালি দেয় এবং তার প্রমাণ পাওয়া যায়, তবে এটি সাধারণত আইনের রক্ষণাবেক্ষণকারীদের মনোযোগ পায় না; যেমনটি উপরে বলা হয়েছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের অপদার্থতার কারণে তথাকথিত ছাত্ররা, এরফলে, যা-খুশি করার একটা ছাড়পত্র পেয়ে যায়; যারা এখন শাস্তির ভয় না থাকায় প্রায়শই নানা দুষ্কর্মে প্রবৃত্ত হতে উৎসাহিত হচ্ছে। ছাত্রদের একটি অংশ অন্য অনেকের মূল্য চোকানোর বিনিময়ে, সংকীর্ণ এবং পক্ষপাতমূলক লাভের জন্য, শিক্ষাঙ্গনের আবহকে কীভাবে কলুষিত করছে, এটি তার একটি স্পষ্ট নজির। এর পরিণতি ভয়ংকর; কারণ শিক্ষাঙ্গনের সিস্টেম কেবলমাত্র পেশিশক্তির পরিপোষক হলে চলে না। দীর্ঘকাল এমন চললে শিক্ষাঙ্গনগুলি তার প্রাণশক্তি খোয়াবে। ২০২২ সালের মাঝামাঝি শ্রীলঙ্কার ব্যবস্থাতন্ত্রের (সিস্টেমের) আকস্মিক বিপর্যয় তার উদাহরণ।

ছাত্রদের ছাত্রত্ব খুইয়ে ফেলার একটি গুরুতর কারণ হল শিক্ষকদের একটি বিশেষ গোষ্ঠী এবং বিপথগামী ছাত্রদের একটি বিশেষ গোষ্ঠীর মধ্যে অপবিত্র যোগসাজশ। শিক্ষকরা এই বিশেষ গোষ্ঠীর সমর্থনে নিজেদের ক্ষমতাবান মনে করেন, এবং সেই ক্ষমতার সমর্থনে নানারকম ধ্বংসাত্মক কাজ করতে পারেন। এই শিক্ষকেরা তাঁদের সুরে সুর মিলিয়ে যাদের নাচতে বাধ্য করেন; এবং তারা যখন কর্তৃপক্ষকে অপদস্থ করে, তখন তাঁরা অত্যন্ত আমোদ উপভোগ করেন। এই শিক্ষকেরা সেই বিজ্ঞানীর দুর্দশার কথা ভুলে যান, যিনি ফ্রাঙ্কেনস্টাইন কাহিনির দানবকে তৈরি করেছিলেন, আর যার পরিণতি হয়েছিল ভয়াবহ। আখ্যানটি যদিও কাল্পনিক, তবু মনে রাখতে হয়, ইতিহাস বারেবারেই এই সত্য সপ্রমাণ করেছে।

ছাত্রদের মধ্যে মূল্যবোধ জাগ্রত করার দায়িত্ব রয়েছে শিক্ষকদের। তার বদলে তাঁরা যদি অশোভন কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হন, তবে বলতে হয়, তাঁরা শিক্ষার্থীদের বিপথগামী করার জন্য সমানভাবে দায়ী। সংকীর্ণ স্বার্থের জন্য শিক্ষকরা প্রায়শই তাঁদের সীমানা অতিক্রম করেন, এবং তাঁদের ছাত্রদের সামনে এমন মন্দ উদাহরণ স্থাপন করেন যা তাঁদের নির্দিষ্ট-নির্ধারিত ভূমিকার ঠিক বিপরীত। এই ধরনের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করার সময় তাঁরা যে কেবল সাধারণ মানুষের চোখে পড়েন তা-ই নয়, তাঁরা ব্যাপকভাবে প্রচারিত এই গণঅভিযোগকেই (যদিও সবক্ষেত্রেই যথার্থ নয়) কার্যত মান্যতা দেন যে উচ্চ বেতনপ্রাপ্ত শিক্ষকরা তাঁদের প্রধান দায়িত্ব পালনের পরিবর্তে এমন কাজগুলিতে জড়িত হতে ভালবাসেন যা তাঁদের একেবারেই মানায় না।

বিশ্বভারতী শুধুমাত্র একটি ডিগ্রি প্রদানকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নয়। বস্তুত এটি গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো অত্যন্ত গভীর ও উদ্ভাবনী প্রজ্ঞাময় একজন ব্যক্তিত্বের রাজনৈতিক-মতাদর্শগত অবস্থানের সঙ্গে সংস্পৃষ্ট তাঁর দর্শনকেও তুলে ধরে। সেই হিসেবে, এখানকার শিক্ষক এবং ছাত্রদের দায়িত্ব রয়েছে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বিশ্বভারতীর ঐতিহ্য বহন করে নিয়ে চলা। বিশ্বভারতীকে দেশের কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গেই তুলনা করা যায় না; এবং সেইজন্যই এর স্বতন্ত্র সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিশেষত্বকে ভুলে যাওয়া উচিত নয়— যা কিনা এই শিক্ষাকেন্দ্রের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জুড়ে রয়েছে। এখানকার নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানগুলিকে তাই নিছক আচার-অনুষ্ঠান বলে উড়িয়ে দেওয়া উচিত নয়। এগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ের নৈমিত্তিক কর্মসূচির সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত। অতএব, কেউ যদি বিশ্বভারতীর এইসব অনুষ্ঠানগুলি এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে তবে তা কিছুতেই মানা যায় না। উপাচার্য হিসাবে আমি আমার মেয়াদকালে নিয়মিতভাবে বিশ্বভারতীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট

সবাইকে আন্তরিকভাবে অনুরোধ করতে থাকি যে, যে-কোনওভাবে এর অংশীদার হওয়া সবার কর্তব্য। যাই হোক, তার ফলাফল তেমন সন্তোষজনক হয়নি; আর তার কারণ খুঁজে পাওয়াও খুব কঠিন নয়।

একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। প্রতি বুধবার বিশ্বভারতীর কাচমন্দিরে উপাসনা হয়। আমাকে বলা হয়েছিল যে পাঠভবনের শিক্ষার্থীদের বাধ্যতামূলক উপস্থিতি ব্যতীত অন্যান্যদের উপস্থিতি সর্বদা নগণ্যই থাকে। উপাসনায় আমার নিয়মিত উপস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিতির হারের কিছুটা উন্নতি হয়। যা লক্ষণীয় তা হল সেই সমস্ত বিশ্বভারতী-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অনুপস্থিতি— যাঁরা শুধুমাত্র মুখে গুরুদেবের আদর্শের সঙ্গে তাঁদের আবেগব্যাকুল সম্পর্ক ব্যক্ত করেন! তাঁদের কাছে কবি এমন এক পণ্য, যাঁকে সুবিধামতো সময়ে বিকিয়ে দেওয়া যায়; এবং যাঁর সৌজন্যে নিজেদের একান্ত স্বার্থ চরিতার্থ করা যায়। অন্যথায় এই 'তথাকথিত রাবীন্দ্রিক'রা নিশ্চিত ভুলে যান যে কথায় কথায় তাঁরা কী বলে থাকেন, আর কী ভূমিকাই বা তাঁরা পালন করছেন!

উপরিউক্ত বিশদ ব্যাখ্যানের উদ্দেশ্য হল এই বিষয়টি তুলে ধরা যে অনেক শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মী বন্ধু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জীবিকা অর্জন করা সত্ত্বেও তাতে কাম্য অংশগ্রহণ এড়াতে সদাতৎপর। তাঁদের মধ্যে অনেকেই ভোরবেলা বৈতালিকে অংশগ্রহণ করেন না (বছরে মাত্র পাঁচটি) এই কারণে যে, তাতে ঘুম থেকে উঠতে হয় খুব তাড়াতাড়ি। অবশ্য তাঁদের যদি সকালের ট্রেন ধরতে হয় তবে তাঁরা আনন্দের সঙ্গেই তা ধরে থাকেন! শিক্ষকদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অনেক শিক্ষার্থীও এখন বিশ্বভারতীতে উচ্চশিক্ষা নিচ্ছেন একই ছকে। মজার ব্যাপার হল, রবীন্দ্রনাথের ঐতিহ্য রক্ষায় তাঁদের লোকদেখানো জেদ আছে, অথচ বিশ্বভারতীর আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি তাঁরা শ্রদ্ধাশীল নন; যা কবি এই মহান শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে সম্পর্ক শক্তিশালী করার জন্য প্রণয়ন করেছিলেন। ক্যাম্পাসে অনেক অপ্রীতিকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়ার পরে, আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে আমি আমাদের প্রিয় ছাত্রদের কাছ থেকে অনেক নতুন নতুন ব্যাখ্যা শিখেছি। এসব অপমান তাদের শিক্ষকদের উপর নিক্ষেপ করা হয়। এটা কি দুর্ভাগ্যজনক নয়? যারা তাদের ক্রিয়াকলাপকে ন্যায়সংগত বলে দাবি করে তারা বিশ্বভারতীর নির্ধারিত মৌলিক নিয়মগুলি লঙ্ঘন করে। অনুতাপ করার পরিবর্তে এই তথাকথিত ছাত্ররা বিশ্বের কাছে এই সাব্যস্ত করে আমোদ পায় যে তারা তাদের শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করার ক্ষেত্রে পারদর্শী।

## অফলাইন এবং অনলাইন পরীক্ষার ব্যর্থতা

এটা শুধুমাত্র বিশ্বভারতীতেই সম্ভব যে আমরা আমাদের কাম্য সংকল্পের সঙ্গে ছলনা করে ঘোমটার আড়ালে খেমটা নাচি। শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও প্রশাসন একসঙ্গে বসে শেষ সেমিস্টারে অফলাইনে পরীক্ষার জন্য সম্মত হয়েছে যেহেতু পাঠদান অফলাইনেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সময়মতো পাঠদান শেষ না হওয়ায়, সমস্ত পাঠদান শেষ হলে অফলাইনে পরীক্ষা নেওয়ারও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। শিক্ষার্থীদের প্রস্তাবিত পরীক্ষার তারিখগুলিও গ্রহণ করা হয়েছিল। সুতরাং, তারিখ এবং পরীক্ষার ধরন(অফলাইন) সম্পর্কে একটি ঐকমত্য তৈরি হয়েছিল। কিন্তু বিধাতা বোধহয় তা চাননি! রাজ্যের তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়— বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় এবং বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় অনলাইন পরীক্ষার পথে কেন গেল তা তারাই ভাল জানে। এবার আমাদের স্বঘোষিত ছাত্রনেতারা তৎপর হল। তারা একটি যুক্তি পেশ করেছিল যে যেহেতু প্রতিবেশী বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে পরীক্ষা অনলাইনে অনুষ্ঠিত হচ্ছে, তাই বিশ্বভারতীরও অনলাইন পরীক্ষা নেওয়া উচিত।

কী যুক্তি! কতিপয় অসন্তোষপ্রবণ  শিক্ষকের সমর্থনে ছাত্রদের বিপথগামী অংশ অতিরিক্ত অক্সিজেন পেল। তাই মনে করল শিগগিরই তাদের দাবি পূরণ হবে। কয়েকজনকে বাদ দিয়ে, বেশিরভাগ শিক্ষক পাঠদান সম্পূর্ণ হওয়ার পর এই ধরনের অদ্ভুত দাবিকে সমর্থন করেননি এবং পাঠক্রমের কোর্সগুলি সম্পূর্ণ করার জন্য, তাঁরা তাঁদের গ্রীষ্মকালীন ছুটিকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বিসর্জন দিয়েছিলেন। তারপরও শিক্ষার্থীদের রাজি করানো যায়নি। তারা অনলাইন পরীক্ষা চেয়েছিল কারণ এটি তাদের পক্ষে সুবিধাজনক ছিল। সম্ভবত তাদের প্রস্তুতির ঘাটতি বা অন্য কোনও স্বার্থপ্রণোদিত কারণে তারা অফলাইনে পরীক্ষা দিতে খুব ভয় পায়; যা ঠিক এই প্রকাশ্য পরিসরে কহতব্য নয়। মহামারীকালীন সময়ে অনুষ্ঠিত পরীক্ষার ফলাফলের সঙ্গে এর পরবর্তী পরীক্ষাগুলির ফলাফল তার একটি যুক্তিসংগত ব্যাখ্যার ইঙ্গিত দেয়।

এই নাটকটি কীভাবে অভিনীত হয়েছে? পরীক্ষার প্রথম দিনে শিক্ষক এবং পরীক্ষায় বসতে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীরা পরীক্ষার হলে গিয়েছিলেন কিন্তু তাঁদের ভবনের ভিতরে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি, কারণ অফলাইন পরীক্ষার বিরোধীদের সৌজন্যে সম্ভবত প্রধান প্রবেশদ্বারটি তালাবদ্ধ ছিল। নিরন্তর আবেদন সত্ত্বেও শিক্ষার্থীরা অনড় থাকে এবং ক্যাম্পাসে কোনও পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতে পারেনি। পরীক্ষার দ্বিতীয় দিনটিও তদ্রূপ। পরীক্ষা দিতে অনিচ্ছুক ছাত্ররা সমবেত হয়েছিল এবং যে ভবনগুলিতে পরীক্ষার হল ছিল সেখানে সেখানে প্রবেশদ্বারে তালা ঝুলিয়েছিল। শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মীরা পরীক্ষা চালাতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়ায় তাঁরা শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা দেওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন; এবং তাঁদেরই পরামর্শ অনুসারে এই প্রয়াস চলতে থাকে। কোনও যুক্তি কাজ করেনি। অনলাইন পরীক্ষার জন্য অনড় থাকায় তারা পরীক্ষার দ্বিতীয় দিনের স্লটে নির্ধারিত পরীক্ষা দিতে অস্বীকার করে। তৃতীয় দিনে, ক্যাম্পাস ইন্টারভিউয়ের পরে চাকরির জন্য নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা পরীক্ষা বানচালের সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া ছাড়া এই নাটকের পুনরভিনয়ের কোনও ব্যতিক্রম ঘটেনি। এতে অবশ্য কাজ হয়েছে, এবং অনেকেই কর্মসচিব এবং উপাচার্যের কাছে গিয়ে তাদের পরীক্ষায় বসার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। প্রশাসন ছাত্রদের সাহায্য করার চেষ্টা করেছিল কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। বিকেলের মধ্যে, ইচ্ছুক শিক্ষার্থীরা অধ্যক্ষকে (অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে ডিন) পরীক্ষার ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ করেছিল, এবং তারা পরীক্ষা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল। সুতরাং, দর্শন বিভাগে পরীক্ষা শুরু হয় প্রায় বিকাল ৫-টায় এবং এর পরে ওড়িয়া বিভাগে সন্ধ্যা ৭-টায় শুরু হয় পরীক্ষা। চমক তখনও অপেক্ষা করছিল। রাত ৯-টার দিকে, শ্রীনিকেতনে অবস্থিত একটি বিভাগের একজন অধ্যক্ষ উপাচার্যের সঙ্গে যোগাযোগ করে বলেছিলেন যে বিভাগটিতে রাত্রি ১০-টার পরে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত করা যায় কি না? শিক্ষার্থীরা পরীক্ষা দিতে ইচ্ছুক হলে প্রশাসন এ প্রস্তাবে সম্মতি জানায়। ছাত্ররা রাজি হল। তাই পরীক্ষা শুরু হল রাত্রি ১১-টায়। এটি একটি নজিরবিহীন ঘটনা, কারণ এত বিলম্বে পরীক্ষা শুরু করে পরের দিন পর্যন্ত গড়িয়ে যাওয়ার নজির আগে ছিল কি না বলা যায় না! ব্যাপারটা এমন হল যে পরীক্ষার সময়কাল যেহেতু তিন ঘণ্টা, শেষ হতে লাগল রাত ২টো। রাতের বেলায় প্রতিটি পরীক্ষার্থীকে নিরাপদে বাড়িতে পাঠানোর জন্য প্রশাসন যথেষ্ট যত্ন নিয়েছে। নিরাপত্তা কর্মী, পরিবহন এবং পরীক্ষা পরিচালনার সঙ্গে যুক্তদের সহায়তায়, সকলের সন্তুষ্টিতে সেই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। পরে ভোর ৩-টার দিকে নিজ বাসভবনে ফিরে আসেন উপাচার্য ও তাঁর সহকর্মীরা।

যদিও গল্পটি এখানেই শেষ নয়। শিক্ষার্থীদের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে গৃহীত পরীক্ষা গভীর রাতে অনুষ্ঠিত হওয়ায় উপাচার্যকে গালিগালাজ করে পরদিন থেকে সামাজিক মাধ্যমে একটি বার্তা ছড়িয়ে পড়ে। এটা আমার কাছে আশ্চর্যের বিষয় যে এই বিপথগামী ছাত্ররা কি নিজেরাই এমন কম্মোটি করেছিল, না কি এর পিছনে ছিল অসন্তোষপ্রবণ শিক্ষকদের প্ররোচনা! কোনও তদন্তেই আমাদের

এই প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর মিলবে না। কিন্তু প্রাপ্তবয়স্ক ছাত্ররা তাদের দায়িত্ব এড়াতে পারে না, কারণ বিশ্ববিদ্যালয়কে তাদের রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম হিসাবে তারাই ব্যবহার করে এবং তারা তাদের রাজনৈতিক অভিভাবকদের নির্দেশনা অনুসারে শিক্ষানবিশ পর্যায়ে এখানেই তাদের দক্ষতাকে শাণিত করে তোলে।

বেশির ভাগ ছাত্রের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় হল শিক্ষার জায়গা। শিক্ষকদের জন্য এটি শেখার এবং জীবিকা-অর্জনের জায়গা। শিক্ষাকর্মীদের জন্য এটি জীবিকা উপার্জনের এবং আন্তঃব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে তোলার জায়গা। বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে উপরিউক্ত তিনটি বিভাগের প্রত্যেকটিতেই দুর্বৃত্ত ছিল এবং তারাই সাধারণত ক্যাম্পাসে উপদ্রবের উৎস। কর্তৃপক্ষের কাছে তাদের পথে ফিরিয়ে আনার প্রশাসনিক উপায় রয়েছে যা ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে সাধারণত প্রয়োগ করা হয়। কোনও কর্তৃপক্ষই অপ্রীতিকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পছন্দ করে না। প্রশাসনকে একেবারে দেওয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দিলে তবেই, বস্তুত সংশোধনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণের অভিপ্রায়ে, বিকল্প পন্থাগুলি প্রয়োগ করতে হয়। আইনের যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হলেও অনেক সময় 'দাদাভাইদের' অদৃশ্য হাতের ভেলকিতে প্রশাসনের এগিয়ে যাওয়া বাধাগ্রস্ত হয়।

শিক্ষার কেন্দ্র হিসেবে বিশ্বভারতী ভাল এবং মন্দ দুইই। ভাল; কারণ এটি এমন একটি বিরল বিদ্যাপ্রতিষ্ঠান যা এর প্রতিষ্ঠাতা, নোবেল বিজয়ী গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের জীবন-দর্শনের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল। সুতরাং, এই মহান প্রতিষ্ঠানের অংশ হয়ে আমরা স্বাভাবিকভাবেই একটি মহান ঐতিহ্যেরও অংশ হয়ে উঠি। দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় বা অন্য কোথাও যেখানে একজনকে একটি ঐতিহ্য গড়ে তুলতে হয়, সেখানে আমরা বিশ্বভারতীর অংশ হিসেবে আপনা থেকেই এর ঋদ্ধ ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী। বিশ্ববিদ্যালয়ে এত খারাপ কিছু নেই। শুধুমাত্র একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠী আছে যারা সামান্য অজুহাতে এর ভারসাম্য নষ্ট করে দিচ্ছে। তারা বোধহয় ভুলে যাচ্ছে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমৃদ্ধিতে সবারই সমৃদ্ধি। উলটোটা হলে কেউই লাভবান হবে না। এই দিকটির প্রতি সম্পূর্ণ অসংবেদনশীল হয়ে তারা ভুলে গেছে যে এটি তাদের জন্য এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যও একরকম 'হারাকিরি'র তুল্য।

প্রফেসর বিদ্যুৎ চক্রবর্তী
উপাচার্য, বিশ্বভারতী